কল্পকথা

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

মূল্য আট আনা।

কান্তিক প্রেস—২০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা
হইতে শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত এবং ইণ্ডিয়ান
পাব্লিশিং হাউস—২২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে শ্রীমণিলাল
গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

পূজনীয়

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের

শ্রীচরণে

এই গ্রন্থের অধিকাংশ গল্প জাপানী গল্পের ভাব লইয়া রচিত। ছবিগুলিও জাপানী।

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

কলিকাতা
২৫শে আশ্বিন ১৩১৬

সূচী

কল্পকথা

বৈরাগ্য

(১)

সমস্ত দিন বনে বনে ঘুরিয়া এক ব্যাধ হতাশ মনে বাড়ি ফিরিতেছে—সে দিন সে একটিও শিকার পায় নাই।

শীতকাল—চারিদিকে কন্‌কনে বাতাস। পরিশ্রমে কাতর, ক্ষুধায় পীড়িত, তাহার উপর শীতের বাতাস গায়ে ছুঁচ ফুটাইতেছে! ব্যাধ অবসন্ন শরীরটাকে কোন রকমে বহন করিয়া ঘরে ফিরিতেছিল।

পথে নদী। তাহার ঘোলা জলের স্রোতে সাদা মেঘের মত এক জোড়া হাঁস ভাসিয়া

যাইতেছে। তাহাদের কণ্ঠের কল্ কল্ শব্দ নদীস্রোতের ছল্ ছল্ শব্দে মিশিতেছিল!

হাঁস বধ করা বড় নিষ্ঠুর কাজ। কিন্তু সে কথা বিবেচনা করা চলিল না—ব্যাধের ক্ষুধা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল।

বিপদ দেখিয়া দুইটা হাঁসই পালাইতে গেল, কিন্তু একটা হাঁস ব্যাধের শরে মরিল;—সেখানকার জলটা একেবারে লাল হইয়া উঠিল!

স্রোতমুখে টক্‌টকে রক্তের একটা রেখা ব্যাধের পদ স্পর্শ করিল! ব্যাধ শিহরিয়া চোখ বুজিয়া ফেলিল!

(২)

হাঁসের মাংসে কোন রকমে ক্ষুধা মিটাইয়া ব্যাধ সে রাত্রে ঘুমাইতেছে, স্বপ্নে দেখিল এক পরমাসুন্দরী বালিকা তাহার শিয়রে।

পদ্মের মত তাহার সুন্দর মুখ খানি ম্লান,—চোখে জল—বুকে দীর্ঘশ্বাস! দেখিয়া ব্যাধের করুণা হইল।

বালিকা উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিতেছিল। তাহার সে কান্নায় ব্যাধেরও চোখে স্বপ্নে জল দেখা দিল।

বালিকা কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিল —"নিষ্ঠুর তুমি কি করলে—আমার কি সর্ব্বনাশ করলে! সে তোমার কি করেছিল—তুমি তার প্রাণ নিলে? নদীর বুকে আমরা কি সুখেই ছিলাম—নির্দ্দয়ের মত সে সুখস্বপ্ন তুমি আমাদের কেন ভাঙলে! তোমার তীর, আমার বুক থাকতে, আহা! তার কোমল বুকে কেন বাজল!"

ব্যাধের মনে হইল যেন এক একটি কথা এক একটি বিষধর হইয়া তাহাকে দংশন করিতেছে। সে যাতনায় চীৎকার করিয়া উঠিল—"থামো থামো, আর বোলোনা।"

বালিকা তখন গুন্ গুন্ করিয়া বলিতে লাগিল—“আমিই তাকে নদীতে ডেকে এনেছিলুম—হায় হায় কেন আন্লুম! কখনো যে তাকে ছেড়ে থাকিনি;—আজ কতক্ষণ সে আমার কাছে নেই;—আমি একলা—নিতান্তই একলা—ওহো একথা মনেও যে আনতে পারি না!”

তাহার পর আবার উচ্চস্বরে বলিল—“নির্দ্দয় ব্যাধ! কিছু বুঝতে পারছ না তুমি কি অবস্থা আমার করেছ—তুমি কল্পনায়ও তা আনতে পার না!—দেখো কাল সকালে দেখো, নদীতীরে—আমার কি দশা!”

বালিকা ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

ব্যাধের স্বপ্নও টুটিয়া গেল। সে জাগিয়া উঠিয়া দেখিল—চোখের জলে বিছানা ভিজিয়া গিয়াছে। তাহার চোখে তো কখনো জল আসে না—সে ভাবিল এ সেই বালিকারই

চোখের জল। তাহার মন অনুশোচনার আগুনে যেন দগ্ধ হইতে লাগিল। তাহার কানে কেবলই বাজিতে লাগিল—"কাল সকালে দেখো নদীতীরে আমার কি দশা!" ব্যাধ সে কথা ভুলিতে পারিল না।

আজ তাহার অন্তরে এ কিসের প্লাবন! সে কখনো তো কাহারো জন্য দুঃখ বোধ করে নাই—কাহারো দুঃখে সে কখনো তো কাতর হয় নাই!—স্বপ্নে দেখা একটা বালিকার দুঃখে কেন তবে তাহার প্রাণ কাঁদিতেছে?

(৩)

ব্যাধ সকালে নদীতীরে গেল—আজ তাহার হাতে ধনুর্ব্বাণ নাই!

নদীর ঘোলা জলে ধূলাকাদা মাখা একটি মাত্র হাঁস ভাসিয়া আসিতেছে। কাল সন্ধ্যা-বেলা সে যে দুটি হাঁস এক সঙ্গে দেখিয়াছিল! সেই কথা, তাহার দেহের রক্তের সহিত

হৃৎপিণ্ড হইতে বাহির হইয়া, সমস্ত শিরার মধ্যে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। তাহারই উত্তেজনায় সে পাগলের মত হইয়া উঠিল।

হাঁসটি ভাসিয়া ভাসিয়া তাহারই দিকে আসিতে লাগিল। কালকের মত তাহার কণ্ঠে আজ সে কলরব নাই—নদীর জলে সে ছল্‌ছল শব্দ নাই—ব্যাধের সে ক্ষুধাও নাই!

ব্যাধ দেখিলেই হাঁস পালায় কিন্তু এখন সে নির্ভয়ে তাহার দিকে সমান অগ্রসর হইতেছে। ব্যাধ অবাক্ হইয়া গেল!

হাঁসটি ব্যাধের পায়ের কাছে আসিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল। তাহার পর, ব্যাধের চোখের সামনে নিজের চঞ্চু দ্বারা নিজের বক্ষ একেবারে বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল! ব্যাধ তাহা দেখিয়া চক্ষু মুদিল!

ধনুর্ব্বাণ সে ঘরে ফেলিয়া আসিয়াছিল;—সে ঘরে আর সে ফিরিল না—সেখান হইতেই উদাসী হইয়া চলিয়া গেল!



প্রত্যাগমন

(১)

খুব ছেলেবেলা হইতে ওটির সহিত নেগা-ওর বড় ভালবাসা ছিল—যেন এক বোঁটায় ছুটি ফুল; তাহারা এক সঙ্গে থাকে, একসঙ্গে খেলে, একসঙ্গে বেড়ায়।

আবার ওটির পিতাও নেগাওর পিতার বন্ধু। তাঁহাদের ছুজনের মধ্যে এই মন্ত্রণা ছিল যে, এই ছুইটি ছেলেমেয়েকে বিবাহের রাঙা সুতা দিয়া বাঁধিতে হইবে—ইহাদের যেন ছাড়াছাড়ি না হয়।

কিন্তু একটি ব্যাঘাত ঘটিল। ওটির যখন বয়স পনেরো তখন হঠাৎ একদিন প্রকাশ পাইল যে তাহাকে কালরোগে ধরিয়াছে—সে বেশি দিন বাঁচিবে না। তখন বিবাহের কথাটা একেবারে চাপা পড়িয়া গেল।

ওটি যখন বুঝিল তাহার ইহসংসারের খেলা শেষ হইতে আর বিলম্ব নাই, তখন এক-দিন নেগাওকে ডাকিয়া পাঠাইল,—তাহার কাছে জন্মের মত বিদায় চাহিয়া লইবে।

নেগাও ওটির বিছানার পাশে আসিয়া বসিল। ওটি তখন বলিল—"নেগাও-সান্! আমরা চিরকাল একসঙ্গে কাটিয়েছি,—এবার বিচ্ছেদ,—এখন বিদায় দাও।"

কথাটা নেগাওর বুকে বাজিল। সত্যই ওটিকে বিদায় দিতে হইবে, একথা তাহার মন কিছুতেই মানিতে চাহিল না ;—সে বাধা দিয়া বলিল—"না, ওটি, না,—তুমি অমন কথা মুখে এনোনা। তুমি নিশ্চয়ই ভালো হ'বে—শীঘ্রই সেরে উঠবে।"

ওটি বলিল—"আমার বেঁচে কাজ নেই নেগাও, মরণই আমার ভালো। যে রোগে ভুগছি তাতে যত দিন বেঁচে থাকবো ততদিন নিজে কষ্ট পাবো, আর সকলকেও কষ্ট দেবো।

যদি কায়েক্লেশে কোন রকমে প্রাণটা থাকে তাতে কি হ'বে! তোমার গৃহিণী হ'লে এ শরীরে তো আর তোমার সেবায় লাগবোনা; বরঞ্চ আমার সেবা তোমাকেই করতে হ'বে— তার চেয়ে মরা ভালো! আমি মরছি তাতে আমার কোন দুঃখ নেই—তোমার বুকে মাথা রেখে মরে আমার যে সুখ সে সুখ বেঁচে কখনো পাব না!"

নেগাওর চোখে জল আর বাধা মানিল না। সে বালকের মত কাঁদিয়া ফেলিল।

ওটি বলিল—"কেঁদোনা নেগাও, কেঁদোনা, আমার জন্য তুমি কেঁদোনা। তোমাকে ছেড়ে যাচ্ছি তবুও আমার তত দুঃখ হচ্ছেনা,— কেন জান? এক আশা আমাকে শান্তি দিচ্ছে। সেই কথা বোলবো বোলেই তোমায় ডেকেছি। আমার প্রাণের ভিতর থেকে কে যেন বল্‌ছে —আমাদের আবার মিলন হবে!"

মুখ হইতে কথাটা কাড়িয়া লইয়া নেগাও

বলিল—"নিশ্চয়! নিশ্চয়! সে অনন্ত মিলন—তার বিচ্ছেদ নেই—সে শান্তিময় পুণ্যধাম!"

ওটি বলিল—"স্থির হয়ে কথাটা শোনো। স্বর্গে মিলনের কথা আমি বলছিনা—এই মর্ত্ত্যেই আমাদের মিলন হবে।"

নেগাও অবাক হইয়া রহিল।

ওটি বলিল—"বিশ্বাস করছনা? কিন্তু আমি বলে রাখছি, এ হবেই! জানো মরণ-কালের কামনা কখনো নিস্ফল হয় না!"

নেগাও ওটির মুখের পানে চাহিল।

সে প্রলাপ বকিতেছে না কি? কিন্তু তাহা তো নয়! তাহার প্রাণের বিশ্বাস যেন তাহার মুখের উপর ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহা দেখিয়া নেগাওর সন্দেহ দূর হইল।

ওটি বলিল—"প্রিয়তম! অপেক্ষা করতে পারবে কি—সেই মিলনের দিন পর্য্যন্ত!"

নেগাও বলিল—"যুগযুগান্তর—জন্মজন্মান্তর

শুধু তোমার অপেক্ষায়, তোমার প্রতীক্ষায় থাকবো ওটি!"

ওটির ম্লান মুখ আনন্দশ্রীতে ভরিয়া গেল!

নেগাও তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিল—"জানোনা কি ওটি, আমাদের সম্বন্ধ শুধু এক জন্মের নয়। আমাদের বিচ্ছেদ ও মিলন জন্মে জন্মে ঘটছে—কখনো তুমি আমার প্রতীক্ষা করছ, কখনো আমি তোমার প্রতীক্ষা করছি—আবার দুজনে মিলছি।"

ওটি বলিল—"না, না তোমার এই জীবনেই আমাকে তুমি পাবে—আমি আবার তোমার কাছে আসবো—এ তুমি স্থির জেনো।"

নেগাও বলিল—"প্রিয়তমে! তুমি আসবে কিন্তু তোমার এ দেহ তো আন্‌তে পারবে না,—তোমার এ স্মৃতি তো থাকবে না—কেমন করে তবে আমাদের দুজনের পরিচয় হবে!"

ওটি তিরস্কারের স্বরে বলিল—"নেগাও!

দেহ দিয়েই কি আমাদেয় সম্বন্ধ? একটু স্মৃতিই কি আমাদের বন্ধন করে রেখেছে?”

(২)

ওটি ইহসংসার ত্যাগ করিয়াছে। নেগাও ওটিকে কত ভালবাসিত এখন বুঝিয়াছে; দিনের মধ্যে সহস্রবার সে এখন ওটির অভাব অন্তরে অন্তরে অনুভব করে—প্রাণের মধ্যে একটা দারুণ জ্বালা জ্বলিতে থাকে। ওটির আশাবাণীই তাহার সান্ত্বনা!

ওটির একটা ছবি লেখাইয়া নেগাও তাহাকে পূজা করিত; ওটির শেষ বাণী ছবিটিতে যেন আঁকা ছিল!

অপেক্ষা নেগাও করিতেছিল। কিন্তু এক একবার সন্দেহ আসিয়া তাহার সেই আশার উপর আঘাত দিত! তখনই ওটির সেই বিশ্বাসভরা মুখখানি তাহার চোখের সামনে

জীবন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিত; তাহার সেই আশার বাণী বাতাসের শব্দে সে শুনিতে পাইত!

নেগাও পিতামাতার একমাত্র সন্তান বলিয়া তাহার অবিবাহিত থাকা চলিল না। অনিচ্ছায় তাহাকে বিবাহ করিতেই হইল।

নেগাও এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিল যে, এ বিবাহটা নিতান্তই বাহিরের জিনিস, —এর সঙ্গে অন্তরের কোন সম্পর্ক নাই;—সে ওটির কাছে খাঁটিই আছে। তখন সে পূর্ব্বের চেয়ে বেশি করিয়া ওটির শেষবাণী স্মরণ ও পাঠ করিতে লাগিল। কিন্তু অল্প-দিনের মধ্যেই স্ত্রীর জীবিত মুখের প্রেমালাপ ওটির অন্তিমকালের কথাটিকে চাপা দিল এবং তাহার সাক্ষাৎ মূর্ত্তি ওটির স্মৃতিকে ছাইয়া ফেলিল!

(৩)

কয়েক বৎসর পরে দেশে মড়ক দেখা দিল। তাহারই স্রোতে দেশের অসংখ্য লোকের সহিত নেগাওর পিতা, মাতা, স্ত্রীও ভাসিয়া গেল! যে গৃহের মধ্যে প্রত্যেক জিনিসের সহিত আত্মীয় স্বজনের স্মৃতি জড়িত হইয়া আছে, সে গৃহে বাস করা নেগাওর পক্ষে নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল। সে দেশ-ভ্রমণে বাহির হইল।

ঈকাও সহরের এক চটিতে বসিয়া আছে, এমন সময় একদিন সকালে সেই চটির দাসী, এক বালিকা, এক পেয়ালা চা হাতে করিয়া নেগাওর ঘরে আসিল। নেগাও তখন অন্য-মনে কি ভাবিতেছিল।

প্রতিদিন সেই বালিকা চা দিয়া যায়, কিন্তু নেগাও তাহার পানে মুখ তুলিয়া তাকায় না। আজ অন্যমনে চায়ের পেয়ালা হাতে করিতে



গিয়া হঠাৎ বালিকার মুখের উপর নজর পড়িল। নেগাও চমকিয়া উঠিল ;—হাতের পেয়ালা ঝন্ ঝন্ শব্দে মাটিতে পড়িয়া গেল।

আজ নেগাওর অনেক দিনের ভোলা-কথা হঠাৎ মনে পড়িল। ওটির মূর্ত্তি নেগাওর মনে তখন ছায়ার মত হইয়া আসিয়াছে ; তবু তাহার মুখের কি-একটা-কেমন ভাব, যাহা সে বারবার দেখিয়াছে, আজ তাহা এই বালিকার মুখে স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিল। নেগাও পাগলের মত ছুটিয়া গিয়া বালিকার হাত ধরিয়া বলিল—"কে তুমি ?"

বালিকা থতমত খাইয়া গেল। নেগাওর মুখের পানে চাহিয়া দেখিল।

নেগাওর তীক্ষ্ণদৃষ্টি তখন বালিকার অন্তর পর্য্যন্ত ভেদ করিতেছে। বালিকা সেই থতমত অবস্থায় বলিয়া ফেলিল—"আমি ওটি !"

তাহার পর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

*　*　*　*

নেগাও সেই বালিকাকে বিবাহ করিয়াছে। এখন তাহাকে নাম জিজ্ঞাসা করিলে সে কখনো বলে না—"ওটি!" ওটি নামে কেন সে নিজের পরিচয় দিয়াছিল সে কথা সে বলিতে পারে না এবং সে ঘটনাও তাহার মনে নাই।

কিন্তু নেগাও জানে যে এই বালিকাই তাহার ওটি!



দোসর

(১)

এক বিজন বন। তার মাঝে একটি ভাঙা কুঁড়ে ছিল। সেই কুঁড়ের ভিতর এক বৃদ্ধ, এক বৃদ্ধা আর কমলকলির মত এক বালিকা থাকিত। কুঁড়ের সামনে এক ঝরণা, তারই পাড়ে তিনটি গাছ ছিল ;—দুইটি বুড়ো একটি চারা। বুড়োবুড়ীর দেহ যেমন শুষ্ক—বুকের কাছে প্রাণটুকু শুধু ধুক্ ধুক্ করিত, বুড়ো গাছ দুইটিরও ঠিক তেমনি অবস্থা। আর বালিকার অঙ্গে যেমন লাবণ্য ঝরিত, চারা গাছটিরও তেমনি সবুজ পাতায় সুন্দর ফুলে দেহ ভরা ছিল। বুড়ো গাছ দুটির মাথায় দুটি বুড়ো পাখী এবং চারাগাছটির ঝোপে একটি ছানা পাখী বাসা বাঁধিয়াছিল।

বর্ষাকাল—অন্ধকার রাত।

একটি ছেলে, ঘোড়ায় পিঠে সেই বনের মধ্য দিয়া যাইতেছে। মুষলধারে বৃষ্টি—ঘন ঘন বজ্রের হাঁকনি, বিদ্যুতের চমকানি,—যেন প্রলয় উপস্থিত!

ছেলেটির শরীর অবসন্ন। ঘোড়াটা নির্জীব। অন্ধকারে পথ আর চেনা যায় না। সাম্‌নে ভাঙা কুঁড়ে খানি দেখিয়া ছেলেটি যেন বল পাইল—ঘোড়া হইতে নামিয়া কুঁড়ের দরজায় ঘা দিল।

বুড়ী আসিয়া দরজা খুলিল। ছেলেটির গায়ে মুখে হাত বুলাইয়া বলিল—"আহা, কার বাছা এই দুর্য্যোগে বনের মাঝে একা বেরিয়েছো!"

বুড়ীর মুখে আদরের কথা শুনিয়া, তাহার স্নেহ-মাখা হাত বুলানোতে ছেলেটির সকল কষ্ট এক নিমেষে দূর হইল। আজ তাহার মনে অনেকদিনের-পাওয়া মার স্নেহ



হঠাৎ জাগিয়া উঠিল! সে মা আজ কোথায়! ছেলেটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিল।

ভাঙা কুঁড়ে। ঝর ঝর করিয়া জলে ঘরের চারিদিক ভাসিয়া যাইতেছে। ছেলেটির জন্য একটু শুক্‌নো জায়গা বুড়ী খুঁজিয়া পাইল না। ভিজে কাকের মত, বুড়োবুড়ী দুজনে মুখোমুখী বসিয়া, রাত কাটাইতেছিল। একটা কোণে একটু শুক্‌নো জায়গায় মেয়েটি ঘুমাইতেছিল। বুড়ী ছেলেটিকে সেইখানে বসিতে বলিল।

মেয়েটির শিয়রে মিটমিটে প্রদীপ। তারই আলোর একটু রেখা মেয়েটির চাঁদ মুখে পড়িয়াছে।

বাহিরের অন্ধকার আকাশে যেমন বিদ্যুৎ, ছেলেটি দেখিল, এই অন্ধকার কুঁড়ের ভিতরও তেমনি বিজলী খেলিতেছে। তার জ্যোৎস্নার মত গায়ের রঙে ঘর আলো!

কড় কড় করিয়া বাজ পড়িল। তারই

শব্দে চমকিয়া মেয়েটি জাগিয়া উঠিল। ঠিক সেই সময় ভাঙা চালের ছিদ্র দিয়া বিদ্যুতের একটু আলো ঘরে আসিয়া পড়িল ;—সেই আলোটুকুতে চার চক্ষের মিলন হইল!

(২)

বুড়োবুড়ীর আদর যত্নে, মেয়েটির মিষ্ট কথায় ছেলেটির সে রাত অতি আনন্দেই কাটিয়া গেল।

তাহারও এমনি এক বৃদ্ধ পিতা, এক বৃদ্ধা মাতা, একটি ছোট বোন ছিল। অনেক দিন তাহাদের স্নেহ হইতে সে বঞ্চিত। আজ হঠাৎ সেই স্নেহ পাইয়া তাহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল। ভাঙা কুঁড়ের মধ্যে বাদলার বাতাস, জলের ছিটা, অনাহার ও অনিদ্রাতেও সে একটা বিপুল আনন্দ পাইল।

পরদিন সকালে আকাশ পরিষ্কার ;

—সূর্য্যের সোনার কিরণে বন জাগিয়া উঠিয়াছে।

বালক বিদায় চাহিল;—কিন্তু বড় অনিচ্ছায়। এই কুঁড়ের মধ্যে সে যে সুখ পাইয়াছে তাহার মত বাপ-মা-হারার ভাগ্যে তাহা কি আর কোথাও মিলিবে!

তবু বিদায় চাই!

বিদায়ের পূর্ব্বে ছেলেটির মনে একটা ব্যাকুলতা জাগিয়া উঠিল। এই পরিবারটির দৈন্য সে কি কিছুমাত্র মোচন করিতে পারে না? মোহরের থলি বাহির করিয়া সে বৃদ্ধার পায়ের তলায় ঢালিয়া দিল। বলিল—"মা, আমি তোমার ছেলে আমার প্রণামী লও।"

বৃদ্ধা ছেলেটির মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিল।

মোহরগুলি ভিজামাটির কাদার মধ্য হইতে পূর্ব্বের চেয়ে চক্ চক্ করিয়া জ্বলিতে

লাগিল। এই ভাঙা কুঁড়ের মাটিতেই যেন তাহাদের বেশি আনন্দ।

"বৃদ্ধা মোহর গুলি না তুলিয়াই বলিল —বাবা, তোমাদের কাছে মোহর অমূল্য, কিন্তু এই বনের মাঝে ওর আদর কেউ বোঝে না।—মোহরে এখানে কিছুই মেলে না।"

এই কথা শুনিয়া বালকের মুখ ম্লান হইয়া গেল।

বৃদ্ধা তাই দেখিয়া বলিল—"তুমি যদি সত্যই আমাদের উপকার করতে চাও, তা হ'লে এক কাজ কর—এই মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে যাও। বাছাকে আমরা ভালো করে খেতে পরতে, ভালো জায়গায় শুতে দিতে পারি না। আমাদের সকল কষ্ট সয়ে গেছে; বাছার কষ্ট দেখে আমাদের বুক ফেটে যায়। মার আমার গায়ে একখানা গহনা নেই, পরবার একখানা শাড়ী নেই!"

"আমরা আর ক দিন? তার পর বাছার কি হবে? সেই আমাদের ভাবনা। তুমি যদি ওকে আদরযত্নে রাখো তা হ'লে আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারি।"

বৃদ্ধার মুখে এমন কথা শুনিবে ছেলেটি স্বপ্নেও ভাবে নাই। আনন্দে সে অধীর হইয়া উঠিল।

মেয়েটিকে ঘোড়ার পিঠে বসাইয়া ছেলেটি যাত্রা করিল। বুড়ো ও বুড়ী যত দূর পারিল সঙ্গে সঙ্গে গেল। শেষে ছেলে ও মেয়েটি সহরের দিকে এবং বুড়ো ও বুড়ী বনের দিকে চলিয়া গেল;—কেবল সেই জায়গায় চার জনের চার ফোঁটা চখের জল পড়িয়া রহিল।

(৩)

ছেলেটি নিজের বাড়ীতে মেয়েটিকে আদরযত্নে রাখিয়া দিল। সোনাদানায়

তাহার অঙ্গ মুড়িয়া দিল। কিন্তু বনের পাখী খাঁচায় আসিয়া যেমন ছট্‌ফট্‌ করে মেয়েটিরও ঠিক সেই অবস্থা হইল। সোনার কাঁকন, জরীর শাড়ী তাহার অঙ্গে বিঁধিতে লাগিল। বনে বনে কাঠ কুড়ানো, হরিণ শিশুর সহিত খেলা, ঝরণার গান, পাখীর মুখে গল্প—এই সব পুরানো কথা মনে করিয়া দিনের মধ্যে সহস্র বার সে দীর্ঘশ্বাস ফেলিত!

বালিকা দিন দিন ফুলের মত শুকাইতে লাগিল।

বনের মাঝে কুঁড়ের সাম্‌নে চারা গাছটিরও পাতা ঝরিতে লাগিল।

বুড়োবুড়ীর দ্বারে মৃত্যুর দূত আসিয়াছে! —গাছ দুটিও ধরাশায়ী হইবার জন্য শুধু অপেক্ষা করিতেছে!

*　　　*　　　*

আর এক দিন ঘোর বর্ষা। মেয়েটি

রুগ্ন শয্যায়। ছেলেটি পাশে বসিয়া। ঘরে মিট্ মিট্ করিয়া প্রদীপ জ্বলিতেছে। কিন্তু তার আলো আজ আর মেয়েটির মুখে পড়ে নাই ;—কেমন-এক-রাশ অন্ধকার সেই মুখের উপর খেলা করিতেছে।

হঠাৎ একটা দমকা বাতাস জানালা ভেদ করিয়া ঘরে আসিল। প্রদীপ নিবিয়া গেল! ঘর অন্ধকার! বাহিরের আকাশে তখনও বিদ্যুৎ খেলিতেছে কিন্তু তার আলো আজ আর ঘরে আসিতেছে না!

ছেলেটি প্রদীপ জ্বালিল। কিন্তু মেয়েটির আয়ুর প্রদীপ কই জ্বলিয়া উঠিল না!

সেই রাত্রেই ছেলেটি সন্ন্যাসীর বেশে গৃহ ত্যাগ করিল। সেই বনের মধ্যে আবার প্রবেশ করিল।

তখনও বৃষ্টি ঝরিতেছে—তখনও বিজলী খেলিতেছে।

হঠাৎ একবার বিদ্যুতের আলোয় ছেলেটি

দেখিল, ভাঙা কুঁড়েটিকে বুকে করিয়া বুড়ো গাছ দুটি মাটিতে পড়িয়া আছে—চারা গাছটি তাদের চাপে দলিত!

বাতাস হায় হায় করিতেছে!



মণি

(১)

সে দেশে আর কোথাও পঞ্চমুখী শাঁখ ছিল না, শুধু এক জহরির ঘরে একটি ছিল। জহরি মনে করিত সে শাঁখ তার সাক্ষাৎ লক্ষ্মী! শাঁখেরই দৌলতে তার এত বাড়বাড়ন্ত! সে লক্ষ লক্ষ মুদ্রার জহরতের চেয়েও বেশি যত্নে সেই শাঁখটিকে সোনার কৌটায় ভরিয়া রাখিয়াছিল। সেই শাঁখটির উপরে দেশ-বিদেশের রাজারাজড়ার লোভ লাগিয়াছিল। সে শাঁখের জন্য জহরির শত্রুর অন্ত ছিল না। কিন্তু জহরি সে সকল গ্রাহ্যই করিত না।

সেই দেশে এক দেবালয় ছিল। তারই পুরোহিত রাজার কাছে আবেদন করিল, —"মহারাজ! অমূল্য শাঁখটা একজন ঘোর

বিষয়ীর ঘরে পড়িয়া মাটি হইতেছে! ও শাঁখের উপযুক্ত স্থান তো জহরির সিন্দুক নয়, —দেবমন্দিরেই উহার শোভা পাওয়া উচিত।”

“অমন শাঁখটা দেশে থাকিতে দেবতার পূজায় যদি না লাগিল তবে সবই বৃথা! ঐ শাঁখের জলে যদি দেবতার পা ধোয়াইতে পারি—তবে তাঁর আশীর্ব্বাদে দেশে স্বর্ণবৃষ্টি হইবেই। তাতে দেশের মঙ্গল—আপনারও গৌরব!”

রাজা শুনিয়া বলিলেন—“কথাটা ঠিক বটে!”

তখনই জহরির কাছে হুকুম গেল, শাঁখ হাজির কর।

জহরি রাজার কাছে আসিয়া জোড়হাতে বলিল—“মহারাজ! আমি সর্ব্বস্ব দিতে পারি কিন্তু, মাপ করুন, শাঁখটি নয়।”

রাজা বলিলেন—“ও শাঁখ তো ধনীর ঘরের শোভার জন্য নয়—ও শাঁখ দেবতার



পূজার। দেবতা চাহিতেছেন—তুমি দান করিবে না?"

জহরি বলিল—"মহারাজ! দেবতা জানি না, রাজা মানি না—শাঁখ আমার প্রাণের চেয়েও বেশি। আমার প্রাণ না গেলে ও শাঁখ কেউ পাবে না!"

রাজা বলিলেন—"ওহে, তুমি ত কম লোভী নও!"

সে কহিল—"হাঁ মহারাজ, আমার লোভ আছে কবুল করিতেছি।"

রাজা কহিলেন—"সেই লোভ দেবতার কাছে বিসর্জ্জন দাও।"

জহরি কহিল—"আজ পর্য্যন্ত তাহা ত পারি নাই—রাজার হুকুমে লোভ ত ছাড়ে না।"

রাজা বলিলেন—"শাঁখ আমার চাই-ই।"

জহরি বলিল—"আমার প্রাণ থাকিতে নয়।"

রাজা বলিলেন—"তবে তোমার প্রাণ দেবতার কাজেই বলি পড়ুক!"

—"জহ্লাদ, জহরিকে বধ কর।"

(২)

শাঁখ দেবতার মন্দিরে আসিল।

রাজার মনে বিস্ময়ের উদয় হইল। একটা শাঁখ—তারই জন্য জহরি প্রাণটা দিল! জিনিসটা এমনই বা কি যে প্রাণ তুচ্ছ করা যায়! নিশ্চয় কোন গূঢ় রহস্য আছে। সেটা কি?

রাজা এক দূতকে ডাকিয়া বলিলেন —"দেখ, শাঁখের ইতিহাস গোপনে সন্ধান লও। সঠিক সংবাদ আনিতে পারিলে বহু পুরস্কার পাইবে।"

দূত সংবাদ আনিয়া রাজাকে গোপনে বলিল—"মহারাজ! ও যে-সে শাঁখ নয়!

উহার মধ্যে এক অমূল্য মণি! পৃথিবীর কোনো দেশে কোনো রাজার ঘরে তেমন মণি নাই।”

রাজা বলিলেন—“ঠিক বটে! নইলে শাঁখের উপর জহরির এত মমতা কেন?”

তারপর মন্ত্রীকে ডাকিয়া কহিলেন—“মন্ত্রী! পঞ্চমুখী শাঁখ আমার চাই।”

মন্ত্রী বলিলেন—“মহারাজ! দেবতার জিনিস যে!”

রাজা বলিলেন—“তা হলই বা।”

মন্ত্রী কহিলেন—“মহারাজ, দেবতার সামগ্রীতে লোভ রাখবেন না। জগতে আপনার অভাব কি আছে!”

রাজা কহিলেন,—“আমার ঐ শাঁখেরই অভাব। তাই ঐ শাঁখেতেই আমার লোভ!”

মন্ত্রী শাঁখ চাহিতে গেলেন। দেবালয়ের পুরোহিত শাঁখটিকে বুকের মধ্যে রাখিয়া বলিলেন—“দেবতার জিনিস আমি কাউকে দিব না।”

মন্ত্রী বলিলেন—"রাজা যে চাহেন!"

পুরোহিত বলিলেন—"রাজার চেয়ে দেবতাকে আমি মানি!"

রাজা সেই কথা শুনিয়া রাগে জ্বলিয়া উঠিলেন। বলিলেন—"পুরোহিত রাজ-বিদ্রোহী! রাজবিদ্রোহীর দণ্ড প্রাণবধ!"

তখনই পুরোহিতের মাথা মশানে লুটাইয়া পড়িল।

(৩)

দেবতার মন্দির হইতে শাঁখ রাজ-মন্দিরে আসিল।

রাজা বলিলেন—"শাঁখ ভাঙো। মণি দেখিতে চাই।"

সাত সমুদ্রের হৃদয়ের ধন সেই কঠিন পদ্ম-কলিটির মত আশ্চর্য্য শাঁখের উপরে বাড়ি পড়িল। স্তরে স্তরে তাহা ভাঙিতে লাগিল;

—প্রভাতের আলোর মত তাহার শুভ্র আবরণটি দুই ভাগ হইয়া গেল, অরুণের আভার মত তাহার রক্তিম মর্ম্মস্থলটি বাহির হইয়া পড়িল। কিন্তু মণি কই?

আঘাতের উপর আঘাত পড়িতে লাগিল —দুর্লভ শাঁখটি টুক্‌রা টুক্‌রা হইল, চূর্ণ চূর্ণ হইল, গুঁড়া হইয়া ধূলা হইয়া গেল—অনন্ত নীল সমুদ্রতল হইতে যে রহস্য বহন করিয়া সে একদিন মানুষের ঘরে আসিয়াছিল অনন্ত-নীলাকাশে তাহা মিলাইয়া গেল।

কিন্তু মণি কোথায়?



হয়কি

(১)

সে কতশত বৎসরের কথা হইল। জাপানে আকামাগোসেকিতে হয়কি নামে এক অন্ধ থাকিত। বীণ্ বাজাইতে, গান গাহিতে, গান রচনা করিতে সমস্ত জাপানের মধ্যে তাহার মত আর কেহই ছিল না। তাহার সেই বীণার তাঁরে মূর্চ্ছনা, মন-গলানো কণ্ঠ ও ভাবে-ভরা কবিতা যে শুনিত সেই ভুলিত। দেশে বিদেশে তাহার নাম রটিয়া গিয়াছিল।

হিকি রাজা জলযুদ্ধে গিয়া মরিয়াছিলেন, তাঁহার বংশে বাতি দিবার আর কেহ ছিল না, এই কাহিনী লইয়া তাহার গান। হয়কির কণ্ঠে সেই গান শুনিতে শুনিতে মনে হইত, যুদ্ধটা যেন চোখের সামনে চলিতেছে।

আবার মাঝে মাঝে এমনি দুঃখের কথা যে শুনিয়া চোখে আর জল রাখা যায় না! এমন কি প্রেতলোকের মানুষরাও তাহার গানে কাঁদিয়াছে, লোকে এমন কথাও বলে।

হয়কি বড় গরীব। কিন্তু সে এমন একটি বন্ধু পাইয়াছিল যে কোনো দিন তাহাকে খাওয়া-পরার কথা ভাবিতে হয় নাই। আমিজাদি দেবালয়ের বৃদ্ধ পুরোহিত গান বড় ভালবাসেন। তিনিই যত্ন করিয়া হয়কিকে দেবালয়ে রাখিয়াছিলেন। হয়কি সেখানে প্রতিদিন দেবতার কাছে গান করিত। তাহার দিন এমনি করিয়া বড় সুখেই কাটিতেছিল।

একদিন গরমীকাল; পুরোহিত শিষ্যদের লইয়া এক মহাজনের বাড়ি দেবপূজায় গিয়াছেন; হয়কি দেবালয়ে একা। সেদিন ভারি গরম;—হাওয়া নাই, গাছের পাতাটি কাঁপেনা। পুরোহিত কখন ফিরিবেন পথ

চাহিয়া হয়কি বারাণ্ডায় বসিয়া আছে। মাঝে মাঝে গুন্ গুন্ করিয়া গান গাহিতেছে। সম্মুখেই বাগান। সেখান হইতে ফুলের গন্ধে বারাণ্ডা ভরিয়া উঠিয়াছে।

রাত দুপুর হইল। পুরোহিত তখনো ফিরিয়া আসেন নাই, হয়কি তখনো জাগিয়া বসিয়া আছে। এমন সময়ে কে একজন বাগানের পথ বাহিয়া বারাণ্ডায় আসিয়া দাঁড়াইল। হয়কি ত চোখে দেখে না। পায়ের শব্দ শুনিয়া মনে করিল বোধ হয় পুরোহিত আসিতেছেন। কিন্তু পরেই তাহার ভুল ভাঙিল। কে একজন ডাকিল—"হয়কি!" তাহার গলাটা কেমন কর্কশ। মনিব যেমন করিয়া হুকুম করে সে তেমনি জোরে ডাকিল। হয়কি চমকিয়া উঠিল। এ তো পুরোহিত নয়,—এ আবার কেরে বাপু!

দেরী হইতেছে দেখিয়া সে লোকটা আরো কড়া করিয়া ডাকিল—"হয়কি!"

এবার হয়কির গাটা ছম্‌ছম্‌ করিয়া উঠিল। সে আস্তে আস্তে কহিল—"আমি অন্ধ,—বুঝিনা কে আপনি।"

তখন সে একটু নরম হইয়া বলিল —"হয়কি! ভয় কোরোনা। আমাকে তুমি চেনোনা। আমি এই দেবালয়ের নিকটেই আছি। আমার প্রভু—এক দেশের রাজা এখন ছদ্মবেশে এই কাছেই থাকেন। তিনি হিকিরাজের সমাধি দেখতে এসেছেন। তোমার নিজের মুখে হিকিরাজের গানের পালা শুনতে তাঁর ভারি ইচ্ছা। তোমাকে তাই নিতে এসেছি। এসো, ওঠো, বীণা নাও।"

চুম্বক যেমন লোহাকে টানে তেমনি কিসে যেন টানিয়া হিকিকে দাঁড় করাইল। তখন সেই মানুষটা হয়কির হাত ধরিয়া পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল। হয়কির বোধ হইল, সেই লোকটার সর্ব্বাঙ্গে ঘাম ঝরিতেছে, আর তাহার হাত হিমের মত ঠাণ্ডা!

প্রথমে হয়কির বড় ভয় হইল। তার পরে সে ভাবিল, ভয় কিসের! রাজার কাছে গাহিতে যাইতেছি, রাজার যোগ্য শিরোপা ত মিলিবে।

হয়কি এমনি নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছে। হঠাৎ সেই লোকটা থমকিয়া দাঁড়াইল। হয়কির মনে হইল যেন তাহারা এক সাত-মহল বাড়ির সামনে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তাহার সঙ্গের লোকটা যেমন চীৎকার করিয়া উঠিল—"কয়মন!" অমনি শব্দ করিয়া সিংহদুয়ার খুলিয়া গেল।

তখন তাহারা একটা বাগানের মাঝখান দিয়া চলিল;—বাগান পার হইয়া আর এক দরজা! তাহার সঙ্গী ডাক দিল —"কে আছো ভিতরে—আমি হয়কিকে এনেছি।"

তখন হয়কির বোধ হইল যেন একটি মেয়ে আসিয়া তাহার হাত ধরিয়াছে।

সেই মেয়েটি এক প্রকাণ্ড সিঁড়ি ভাঙিয়া তাহাকে কোথায় লইয়া চলিল—পা পড়িতে লাগিল যেন নরম মখমলের উপরে। চলিতে চলিতে অনেকগুলি ছোট ছোট ঘর পার হইল। শেষে একটি মস্ত দালানে আসিয়া দাঁড়াইল। মনে হইল, সেখানে অসংখ্য লোক বসিয়া। তাহাদের চুপি চুপি কথার ফিস্ ফিস্ ও পোষাকের খস্ খস্ শব্দে ঘরটা ভরিয়া উঠিয়াছে।

কে একজন হয়কিকে বসিতে বলিল। হয়কি এক নরম মখমলের আসনে বসিল। রাজসভায় যেমন সব কথা হয় তেমনি সেখানে নানান্ রকমের কথা চলিতেছে। সকলেরই গলার স্বর মৃদু।

হয়কি সেইখানে কিছুক্ষণ জিরাইয়া লইল। তখন মেয়ের গলায় কে তাহাকে বলিল—"এখন তবে হিকিরাজের পালা বীণা বাজিয়ে সুরু করে দাও!"

গলার সুরে, কথার ভঙ্গিতে বোধ হইল, বড় ঘরের মেয়ে বটে!

হিকিরাজের পালা সমস্তটা ত এক রাত্রে শেষ করা যায় না, সেই জন্য হয়কি বলিল, —"সবটা ত হবে না—আপনারা কোন্ জায়গাটা শুনতে চান, আজ্ঞা করুন।"

মেয়েটি বলিল—"যেখানে যুদ্ধ বর্ণনা আছে আজ সেই জায়গাটি হোক্।"

হয়কি তখন বীণার তারে ঘা দিতে দিতে গান সুরু করিল। দেখিতে দেখিতে খুব জমিয়া উঠিল। এমন করিয়া তারের উপর তাহার আঙুল পড়িল যে, বর্ম্মে বর্ম্মে ঠন্ ঠন্, অস্ত্রে অস্ত্রে ঝন্ ঝন্, নৌকার ঝপ্‌ঝপ, তীরের শন্ শন্ বীণার তারে তারে বাজিয়া উঠিল। এমনি মনে হইতে লাগিল যেন কতশত নৌকা ছুটিয়াছে, যুদ্ধ বাধিয়াছে—কেহ বা পড়ে, কেহ বা মরণ যাতনায় কাঁদিয়া উঠে!

শ্রোতারা শুনিয়া 'বাহবা বাহবা', 'হায় হায়'

করিতে লাগিল। সকলে বলিল,—মরি মরি এমন গলা ত কখনো শুনি নাই—এমন বীণাই বা কে বাজাইতে পারে।

যত বাহবা পাইল হয়কির বুক ফুলিয়া উঠিল, তাহার গলার জোর বাড়িয়া গেল, তাহার গান আর থামিতে চাহিল না—গানের নদীতে যেন কোটালের জোয়ারে বান ডাকিয়া চলিল!

তার পরে গানের সেই পালাটা আসিল যেখানে বড় দুঃখের কথা! ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা অস্ত্র লাগিয়া মরিতেছে, কুল-বধূরা বুক ফাটিয়া কাঁদিতেছে, শত্রুর হাত হইতে রাজকুমারকে বাঁচাইবার জন্য রাজরাণী জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িতেছেন!

হয়কি গান গাহিতেছে আর তাহার দুই চক্ষু জলে ভাসিয়া যাইতেছে! যাহারা শুনিতেছে তাহারা আর থাকিতে পারিল না, কাঁদিয়া উঠিল। শোক আর বাধা মানে না।

হয়কির কণ্ঠ দিয়া আর সুর বাহির হইতে চায় না ;—সে বীণা ফেলিয়া চুপ করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

ক্রমে সকলের কান্না থামিয়া গেল। ঘরে আর সাড়াশব্দ নাই—চারিদিক গম্ গম্ করিতে লাগিল!

যে মেয়েটি হয়কিকে গাহিতে আজ্ঞা করিয়াছিল সে হয়কিকে কহিল—"বড় আগ্রহ করেই তোমার গান শুনতে এসেছিলুম—যেমনটি শুনলুম এমন ত আশা করিনি! আমাদের প্রভু মোহিত হয়ে গেছেন। তাঁর ইচ্ছা, আজ হতে দু'দিন ধরে রোজ রাত্রে তুমি গান শোনাবে, তার পর তিনি এ জায়গা ছেড়ে চলে যাবেন। আজ যেমন সময় এসেছ কালও ঠিক সেই সময় এসো। আজ তোমাকে যে নিয়ে এসেছে কালও সে তোমাকে আনতে যাবে। একটা কথা মনে রেখো—আজকের কথা খবরদার কারো কাছে প্রকাশ কোরো

না। তাহ'লে বিপদে পড়বে। এখন তবে বিদায় হও।”

একজন দাসী আসিয়া তাহাকে বাহিরে লইয়া আসিল। যে লোকটি তাহাকে আনিয়াছিল সে সেখান হইতে তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া দেবালয়ের বারাণ্ডায় রাখিয়া চলিয়া গেল।

হয়কি যখন বাড়ি ফিরিল তখন প্রায় সকাল হইয়াছে। কিন্তু পুরোহিত তখনো ফিরিয়া আসেন নাই। পুরোহিত ফিরিয়া আসিয়া দেখেন হয়কি ঘুমাইতেছে।

(২)

সে রাত্রে হয়কি আবার বারাণ্ডায় আসিয়া বসিয়াছে—আজ আর পুরোহিতের অপেক্ষায় নহে।

রাত যখন দুই প্রহর তখন সেই লোকটি আসিয়া তাহাকে ডাকিয়া লইয়া গেল। সমস্ত

রাত গান চলিল—যখন ভোরের কাক ডাকিয়া উঠিয়াছে তখন হয়কি বাড়ি ফিরিল।

হয়কি রাতে দেবালয়ে ছিল না—সে কথাটা সেদিন কেমন করিয়া জানা-জানি হইয়া গেল। প্রভাতেই পুরোহিত তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, তিরস্কার করিয়া বলিলেন —"কাল রাত্রে তোমার জন্য আমাদের যে বড় ভাবনা হয়েছিল! তুমি চোখে দেখ না—রাত্রে একা ঘরের বার হও কোন্‌দিন বিপদে পড়বে যে! 'যদি আমাকে জানাতে সঙ্গে লোক দিতাম। তুমি গিয়াছিলে কোথায়?"

যেন কিছুই ঘটে নাই এমনি ভাবে হয়কি কহিল—"কিছু গোপন কাজ ছিল।"

পুরোহিত জিজ্ঞাসা করিলেন—"গোপন কাজটা কি? সেটা কি শুনতে পারি?"

হয়কি কিছু কড়া করিয়া বলিল—"না!"

হয়কি আজ পর্য্যন্ত পুরোহিতের কাছে

কথনো কিছু গোপন করে নাই। আজ তাহার ব্যবহারে তিনি বড় ব্যথা পাইলেন। হয়কির মুখের সে মিষ্ট কথা কোথায়? সে সরল ভাবই বা কই? এমন বদল হইল কিসে? কি তাহার এত গোপন কাজ? আর বন্ধুর কাছেই বা এত গোপন কিসের? এমনি পাঁচ-সাত ভাবিয়া পুরোহিত তাঁহার চাকরদের বলিয়া দিলেন হয়কির উপর তাহারা নজর রাখে যেন—কোথায় যায় দেখিতে হইবে।

(৩)

তাহার পরদিন রাত্রে চাকররা দেখিল হয়কি একলা দেবালয় হইতে বীণা হাতে কোথায় বাহির হইয়া চলিল। তাহারাও লণ্ঠন লইয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে গেল। তখন রাত্রি ঘোর অন্ধকার—অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছে। হয়কি এত জোরে চলিয়াছে যে

চাকররা আর তাহার সঙ্গ রাখিতে পারিল না। যে যে বাড়িতে হয়কির যাওয়া-আসা ছিল সর্ব্বত্রই তাহারা তাহাকে খুঁজিতে লাগিল। শেষকালে কোথাও না পাইয়া যখন ফিরিয়া আসিতেছে তখন শুনিতে পাইল হিকিরাজের সমাধির দিক হইতে যেন বীণার আওয়াজ পাওয়া যায়।

লণ্ঠন লইয়া সেখানে গিয়া দেখিল, কোথাও একটি জনমানব নাই ;—অন্ধকারে মাঝে মাঝে কেবল আলেয়ার আলো জ্বলিয়া উঠে। সমাধির দিকে মুখ করিয়া একা হয়কি হিকিরাজের যুদ্ধের পালা গাহিতেছে। তাহার চারিদিকে স্থির আলেয়া মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে।

—"হয়কিসান্! হয়কিসান্! ওঠো, এসো!" এই বলিয়া মন্দিরের লোকেরা চীৎকার করিতে লাগিল। কিন্তু অন্ধ এমনি এক-মনে গান করিতেছিল যে সে কিছুই



শুনিতে পাইল না। তখন তাহারা হয়কির হাত ধরিয়া সবলে নাড়া দিয়া কহিল —"হয়কিসান্! শীঘ্র আমাদের সঙ্গে এসো।"

হয়কি চটিয়া উঠিয়া বলিল—"বেয়াদব! রাজার সাম্‌নে গান গাইচি—দেখছিসনা!"

অনুচরেরা আশ্চর্য্য হইয়া গেল। মাঠের মধ্যে জনমানব নাই এখানে রাজা কোথায়! ভাবিল, হয়কিসানের মাথার গোল হইয়াছে।

তখন তাহারা আর কিছু না বলিয়া হয়কিকে জোর করিয়া দেবালয়ে ধরিয়া লইয়া আসিল। পুরোহিত তখন কাছে ডাকিয়া তাহাকে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

হয়কি ভাবিয়াছিল কিছু বলিবে না। কিন্তু দেখিল তাহার বন্ধু বড় ভয় পাইয়াছেন। তাই তাঁহাকে আশ্বাস দিবার জন্য সকল কথা খুলিয়া বলিল।

পুরোহিত শুনিয়া বলিলেন—"বন্ধু হয়কি! এ যে তুমি মহা বিপদে পড়েছ দেখছি! এ

সকল কথা যদি আমাকে আগেই বলতে! রাজা কোথায়! সে সমস্তই মিথ্যা! তুমি হিকিরাজের সমাধির সাম্‌নে একা বসে গান গেয়েছ, তোমাকে অন্ধ পেয়ে কোন্ সব অপ-দেবতা ভুলিয়ে নিয়ে গেছে! যদি তাদের কথা মেনে আবার গান গাইতে যাও তাহ'লে মারা পড়বে যে! আজ থেকে সাবধান হও, —যা বলি শোনো। আজ আবার আমাকে এক স্থানে পূজা করতে যেতে হ'বে। আমি তোমার গায়ে কতকগুলি মন্ত্র লিখে দেব, তাহ'লে প্রেতেরা তোমার কোন মন্দ করতে পারবে না।

(৪)

পরদিন সন্ধ্যার সময় পুরোহিত ও তাহার এক শিষ্য হয়কির গায়ে, বুকে, পিঠে, হাতে, পায়ে সর্ব্বাঙ্গে মন্ত্র লিখিয়া দিল। তখন পুরোহিত হয়কিকে বলিলেন—"আজ আমি

গেলেই তুমি বারাণ্ডায় এসে বসে থেকো। অন্য দিনের মত আজও একজন লোক তোমাকে ডাকতে আসবে, কিন্তু তুমি কিছুতেই উত্তর দিয়োনা—একচুলও নোড়োনা। যদি কথা কও কিম্বা নড় চড় তা হ'লেই আর রক্ষা নেই! তুমি যদি আমার উপদেশ মত কাজ কর তাহ'লে তোমার বিপদ কেটে যাবে, আর কখনো তোমাকে ভুতের উপদ্রব সইতে হবে না।"

সন্ধ্যার পরেই পুরোহিত দেবালয় হইতে বাহির হইয়া গেলেন। হয়কি বারান্দায় আসিয়া বীণাটি পাশে রাখিয়া বসিল। অতি সন্তর্পনে সময় কাটাইতে লাগিল। পাছে শব্দ হয় বলিয়া নিশ্বাসও ধীরে ধীরে ফেলিতে লাগিল। এই ভাবে তিন চার ঘণ্টা কাটিয়া গেল।

হয়কি বসিয়া আছে। রাত দুই প্রহর। এমন সময় দূরে পায়ের শব্দ শোনা গেল। ক্রমে সেই শব্দ হয়কির কাছে আসিতে

লাগিল। শেষে হয়কির মনে হইল কে একজন আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে।

যে আসিল সে অতি গম্ভীরস্বরে ডাকিল —"হয়কি!"

কিন্তু হয়কি একেবারে চুপ।

কড়া গলায় আবার শব্দ হইল —"হয়কি!"

তবু হয়কির মুখে কথা নাই।

সে লোকটা বিরক্ত হইয়া জোরে জোরে পা ফেলিতে ফেলিতে এদিক ওদিক খুঁজিতে লাগিল। তার পর বলিল—"কৈ, হয়কি কৈ? তার বীণা পড়ে আছে দেখছি—কিন্তু সে গেল কোথা? এ তো হ'বেনা! তাকে খুঁজে বার করা চাইই!"

কিছু পরেই আবার বলিলে—"এ ছুটো কি?—এতো মানুষের কান! ও—বুঝেছি! হয়কি উত্তর দেবে কি করে? তার আর কিছুই নেই যে! শুধু কান ছুটি পড়ে আছে!

কান ত আর কথা কইতে পারে না!
—যাক্, এই কান দুটোই নিয়ে যাই—প্রভু জানবেন তাঁর আজ্ঞা পালন করেছি।"

সেই সময় হয়কির বোধ হইল, কে একজন অতি কঠিন হাতে তাহার কান ধরিয়া জোরে টানিতেছে। যন্ত্রণায় তাহার প্রাণ ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল, কিন্তু অত কষ্টেও সে একটু টুঁ শব্দ পর্য্যন্ত করিল না। শেষে সে লোকটা কান দুইটি একেবারে ছিঁড়িয়া লইল।
—হয়কি চুপ করিয়া সে যন্ত্রণাও সহ্য করিল।

সে লোকটি চলিয়া গেল ;—ক্রমে তাহার পায়ের শব্দও আর শোনা গেলনা। হয়কির কাটা কান হইতে দরদর করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল।

সে মূর্চ্ছা গেল।

(৫)

সকালে যখন পুরোহিত আসিলেন, হয়কির তখনো ভাল করিয়া জ্ঞান হয় নাই—রক্তে সেখানকার মাটি ভাসিয়া গিয়াছে।

পুরোহিত আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"হয়কি! একি হয়েছে ভাই? তোমার চোট লাগলো কোথায়?"

বন্ধুর কথা শুনিয়া হয়কির জ্ঞান হইল। এতক্ষণ সে মড়ার মত পড়িয়া ছিল—যেন তাহার সাড় ছিল না। এখন তাহার বেদনা বাড়িয়া উঠিল, সে ছোট ছেলের মত কাঁদিতে লাগিল। শেষে, একটু ঠাণ্ডা হইয়া রাত্রের কথা পুরোহিতের কাছে আগাগোড়া সমস্ত বলিল।

পুরোহিত শুনিয়া বলিলেন—"হয়কি! তুমি আমাকে মাপ কর। দোষ আমার —সম্পূর্ণই আমার! আমি তোমার শরীরের সকল স্থানেই মন্ত্র লিখেছিলাম, কিন্তু তোমার

কান বাদ গিয়েছিল। যা হবার হয়ে গেছে। এখন যাতে তোমার ঘা শীঘ্র সারে তাই করা চাই। বিপদ তোমার কেটে গেছে,—প্রেতের হাত থেকে তুমি রক্ষা পেয়েছ।”

(৬)

বৈদ্য আসিয়া ঔষধ লাগাইল ;—ঘা শীঘ্রই শুকাইয়া গেল।

হয়কির কান ছিঁড়িয়া লওয়ার কথা চারিদিকে রটিয়া গেল, সেই সঙ্গে তাহার গানের খ্যাতিও চারিদিকের লোক শুনিতে পাইল। নানা দেশ হইতে কত জ্ঞানী, কত ধনী লোক তাহার গান শুনিতে আসিতে লাগিলেন। কয়েক বৎসরেই হয়কির ঘরে আর টাকা ধরেনা। কিন্তু তাহার কান খোওয়া যাওয়ার পর হইতে আর কেহ তাহাকে শুধু হয়কি বলিয়া ডাকিত না—তাহার নাম হইয়াছিল ‘কানকাটা হয়কি’।

প্রাণের রং

(১)

এক চিত্রকর ছিল। সে মাত্র একখানি ছবি লিখিয়াছিল। কিন্তু তারই সময়কার অসংখ্য চিত্রকর অগণ্য ছবি লিখিয়াছিল। তার ছবিতে শুধু এক রঙ ছিল—একটু লাল আভা! অন্য চিত্রকরদের ছবিতে বিচিত্র বর্ণ ছিল। কিন্তু যে সেই এক-রঙা ছবিখানি দেখিত সেইই বলিত—"আহা এমন সুন্দর ছবি কখনো দেখিনি—চোখ জুড়িয়ে যায়!"

সেই লাল রংটি দেখিয়া আর সকল চিত্র-করেরা বলা-বলি করিতে লাগিল—"এ রং ও পায় কোথায়? এমন রং তো কোথাও দেখিনি।"

তাহাকে যখন জিজ্ঞাসা করিল, সে একটু হাসিয়া বলিল—"জানি না।"



তারপর ঘাড় হেঁট করিয়া ছবি আঁকায় মন দিল।

সকলে বলিল—"দেখছ, লোকটার কি অহঙ্কার!"

কিন্তু চিত্রকর এ কথায় কর্ণপাত করিল না। প্রশংসা বা নিন্দায় তাহার মনই ছিল না।

(২)

কোন্ রঙে সে এমন করিয়া ছবি রাঙায় সে রহস্য বাহির করিবার জন্য চিত্রকরের দল উন্মত্ত হইয়া উঠিল। কেউ বিজ্ঞানের বড় বড় বই উল্টাইয়া নানা রকমের লাল রং আবিষ্কার করিল; কেউ দেশবিদেশে রঙের সন্ধানে বাহির হইয়া নানা রং সংগ্রহ করিয়া আনিল, তাহাতে ছবিও আঁকা হইল, কিন্তু তেমন লাবণ্য ফুটিয়া উঠিল কৈ?

এ দিকে সেই চিত্রকর এ সকল কোন

খবরই রাখিল না। আপনমনে ছবিই আঁকিতে লাগিল।

ছবির গায়ে লাল রং যতই ফুটিয়া উঠিতে লাগিল, তার নিজের গায়ের রং ততই সাদা হইতে থাকিল।

অবশেষে একদিন সকলে দেখিল ছবিখানি আঁকা শেষ হইয়াছে; কিন্তু চিত্রকর সেখানি বুকে আঁকড়াইয়া মরিয়া আছে।

যত চিত্রকর ছিল সকলে খবর পাইয়া ছুটিয়া আসিল। তার কুঁড়ে ঘর খানি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতে লাগিল—যদি সে রঙের কোন সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু কোন খোঁজই পাওয়া গেল না।

তার পর, তাহাকে যখন চিতার উপর শোওয়াইল তখন সকলেই দেখিল তাহার বুকের উপর এক ক্ষত চিহ্ন!—সে যে কতদিনের তার ঠিক নাই!



দান

(১)

সব দেবালয়েই ঘণ্টা ছিল, কিন্তু সে দেবালয়ে ছিল না। গ্রামের সকলে বলিল, ঘণ্টা না হইলে কি চলে?—ঘণ্টা একটা চাইই!

কিন্তু দেশে যে পিতল নাই!

এক চাষার মেয়ে বড় ভক্তিমতী ছিল। সে বলিল—"পিতল অভাবে দেবতার আরতি হইবে না? এই নাও আমার আয়না, ইহার পিছনে অনেকটা পিতল আছে।"

মেয়েটি দেবালয়ের ঘণ্টা তৈরির জন্য নিজের আয়না দান করিয়াছে, এই কথা যখন গ্রামে প্রকাশ হইয়া পড়িল, তখন সেখানকার যত রমণী সবাই নিজের নিজের আয়না দান

করিতে লাগিল। পূজার দালান আয়নায় ভরিয়া উঠিল।

চাষার মেয়েটি আপনার আয়নাখানি বড় যত্নে নিজের কাছে রাখিয়াছিল। সে আয়নাটি তাহার মা মারা যাইবার সময় তাহাকে দিয়া যায়। তাহাতে তাহার মায়ের মা, তার মা পর্য্যন্ত মুখ দেখিয়াছে। সেখানি চোখের সামনে ধরিলে সে যেন দেখিতে পাইত তার মার হাসিহাসি মুখখানি তাহাতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। মার শোক প্রবল হইলে সে সেই আয়নাখানির উপর চাহিত, তাহাতেই তাহার শোক দূর হইত। সেখানি সে প্রাণ থাকিতে কাহারো হাতে তুলিয়া দিতে পারিত না,—শুধু দেবতার কাজে লাগিবে বলিয়া তাহা দান করিয়াছে।

কিন্তু দান করিয়া অবধি তাহার মনে সুখ নাই। আয়নাখানির জন্য তাহার প্রাণ ছট্‌-ফট্‌ করিতেছে। যতই দিন যায় তাহার

ব্যাকুলতা কেবল বাড়িয়াই উঠে। আয়নাখানি হইতে মন সে কিছুতেই ফিরাইতে পারে না।

আয়না ত অনেক জমিয়াছে—এখন পিতলের ত অভাব নাই—তবে ঐ একখানা আয়না ফিরাইয়া লইলে দেবতার তাহাতে ক্ষতি কি? কিন্তু দেবতা যাহা গ্রহণ করেন তাহা আর ফিরিয়া পাওয়া যায় না!

আয়নাটি দিনান্তে একবার না দেখিলে তাহার চলে না। সে প্রতিদিন দেবালয়ে গিয়া দূর হইতে আয়নাখানি দেখিয়া আসিত। তাহার ইচ্ছা হইত যে সেখানি চুপিচুপি বুকে লইয়া দেশ ছাড়িয়া পালায়। কিন্তু দেবতার জিনিস সে কেমন করিয়া চুরি করিবে?

কিন্তু তাহার মন যে চুরি করিতেছে! দেবতাকে সে যাহা হাতে করিয়া দিয়াছে তাহার মন যে তাহা ছাড়িয়া দিতেছে না! এত বড় লজ্জার কথা সে কাহারো কাছে মুখ ফুটিয়া প্রকাশ করিতে পারে না—এই বেদনা

সে দিনরাত্রি হৃদয়ের মধ্যে লুকাইয়া বেড়ায়। কেবল দেবতাকে ডাকিয়া জোড় হাত করিয়া বলে—"হে দেবতা আমার এই মমতা কেমন করিয়া কাটিবে! কবে কাটিয়া যাইবে!"

(২)

ঘণ্টা তৈরি হইবার জন্য আয়নাগুলি কারখানায় পাঠানো হইল। কারিগরেরা আগুন জ্বালাইয়া পিতল গলাইতে লাগিল। কিন্তু আগুন যতই জ্বলে একখানি আয়নার পিতল কিছুতেই গলিতে চায় না। সে যেন কঠিন বজ্র দিয়া তৈরি! আগুনে সে কেবল যেন লজ্জায় আরো রাঙা হইয়া উঠে, কিন্তু নরম হয় না—তাহার উপরে যতই হাতুড়ি পড়ে সে যেন কঠিন কণ্ঠে বলিতে থাকে না, না, না! তাহাতে কোন চিহ্নও পড়ে না।

তখন দেবালয়ের পুরোহিত বলিলেন —"এ আয়না যে দান করিয়াছে সে ভাল মনে

দেয় নাই—অনিচ্ছায় দিয়াছে। কে এমন পাপিষ্ঠা যে দেবতাকে একটা সামান্য জিনিস প্রাণ খুলিয়া দিতে পারে না!"

এই কথা শুনিয়া মেয়েটি মরমে মরিয়া গেল। সে কহিল—"এ কি কঠিন আসক্তি! এ যে একেবারে প্রাণের সঙ্গে জড়িত হইয়া আছে! দেবতাকে আমার এই প্রাণটা না দিলে ঐ আয়নাও দেওয়া হইবে না।"

এই বলিয়া সে তখনই দেবতাকে স্মরণ করিয়া সেই অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিল। তাহার দেহ দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

সেই আগুনে আয়নার পিতল গলিয়া গেল।



প্রজাপতি

(১)

সোসাজি সমাধিক্ষেত্রের ঠিক পিছনে একটি কুটীর ছিল। সেখানে জনমানব ছিল না, কেবলমাত্র এক বৃদ্ধ বাস করিত। বৃদ্ধের নাম ছিল তাকাহামা।

তাকাহামাকে সকলেই বড় ভালবাসিত। তার স্বভাবটি এমনি মধুর, তার ব্যবহার এমনি কোমল ছিল যে, তাহাকে যে দেখিত সেই মুগ্ধ হইত।

অনেকে তাহাকে পাগলাটে বলিত। কেননা, দশজনে যেমন করিয়া জীবন কাটায় সেরকম করিয়া সে চলিত না ;—সে কেমন-এক-ধরণের ছিল।

বিবাহ সে করে নাই। সংসারে আপনার বলিবার বড় কেহ ছিল না। কুটীরে সে



একলাই থাকিত। নিজের হাতে সব কাজ করিত। কাহারো কাছে কিছু সাহায্য চাহিত না। গ্রামের আমোদআহ্লাদ পালপার্ব্বণের মধ্যে তাহাকে কখনো মিশিতে দেখা যাইত না। সে নিজের একলা ঘরের ছোটখাটো কাজ লইয়াই সমস্ত দিন কাটাইয়া দিত। সন্ধ্যাবেলা বারান্দায় ছোট এক মাদুরে বসিয়া সে আরাম করিত। আকাশের পানে চাহিয়া আনমনে কি যে ভাবিত তাহা কেহ বলিতে পারে না!

সারা জীবন সে এই ভাবেই কাটাইতেছিল!

(২)

একদিন হঠাৎ বেচারার ব্যামো হইয়া শরীর ভাঙিয়া পড়িল। কে তাহার সেবা করে? গ্রামের কাহাকেও সে ডাকিল না। বিছানায় একলা পড়িয়া রোগযন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিল।

অতি দূর সম্পর্কে কে একজন তাহার আত্মীয়া ছিল। সে বিধবা। গ্রামের লোকে তাহাকে সম্বাদ দিল। সে একদিন তার ছোট ছেলেটিকে সঙ্গে লইয়া তাকাহামার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল।

যত দিন যায় তাকাহামার অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইয়া উঠে।

এক দিন গ্রীষ্মের বৈকালে তাকাহামা অবসন্ন হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। বিধবা ও তাহার ছেলে বিছানার পাশে বসিয়া আছে। কোথা হইতে একটা সাদা প্রজাপতি তাকাহামার মাথার বালিসে আসিয়া বসিল। ছেলেটি পাখার বাতাস করিয়া তাহাকে উড়াইয়া দিল, সে আবার আসিয়া সেইখানে বসিল! ছেলেটি যতবারই তাড়ায় ততবারই প্রজাপতি সেই বালিসে আসিয়া বসে! সে যেন কিছুতেই নড়িবে না!

শেষে ছেলেটি তাহাকে অনেক কষ্টে

তাড়াইয়া বাগানের মধ্যে লইয়া গেল। প্রজাপতি তখনও ঘুরিয়া ঘুরিয়া বার বার ঘরে প্রবেশের চেষ্টা করিতে লাগিল। কোনোরকমে সেখানে যাইতে পারিলেই সে যেন বাঁচে! কিন্তু ছেলেটিও কিছুতেই ছাড়ে না! সে তাহাকে শীঘ্রই বাগান পার করিয়া রাস্তায় আনিয়া ফেলিল।

প্রজাপতি তখন একবার যেন হতাশ হইয়া কুটীরের দিকে ফিরিল, তার পর উড়িয়া চলিল। ছেলেটিও কৌতূহলে পড়িয়া তাহার সঙ্গ ধরিল।

শেষে তাহারা সেই কুটীরের পিছনে সমাধিক্ষেত্রের মধ্যে আসিয়া পড়িল। সেখানে অসংখ্য স্মৃতিস্তম্ভ। একটির পর একটি পার হইয়া প্রজাপতি এক স্তম্ভের নিকট আসিয়া থামিল; তার পর কোথায় মিলাইয়া গেল। ছেলেটি অনেক খুঁজিয়াও তাহাকে আর বাহির করিতে পারিল না।

ছেলেটি দেখিল, সেই স্তম্ভের গায়ে

একটি নাম খোদা আছে। সহজে পড়া যায় না—ভারি অস্পষ্ট! ছেলেটি অনেক কষ্টে পড়িল—"আকিকো!" আঠারো বছর বয়সে সে মারা যায়।

গোরটি বহুদিনের পুরানো। কিন্তু দেখিলে বোধ হয় কে যেন বড় যত্ন করিয়াই সেটিকে নির্ম্মল রাখিয়াছে।

(৩)

ছেলেটি ফিরিয়া আসিয়া দেখে তাকাহামা তখনও চক্ষু মুদিয়া আছে,—মুখে একটুখানি হাসি তখনও লাগিয়া আছে, কিন্তু নিশ্বাস আর বহে না, বুকের কাঁপুনি থামিয়া গেছে।

সে তার মাকে সকল কথা বলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আকিকো কে মা?"

মা বলিল—"আকিকো এই গ্রামেরই একটি মেয়ে ছিল। তাকাহামার সঙ্গে তার বিবাহের ঠিকঠাক এমন সময় হঠাৎ সে মারা যায়!"

ছবি

(১)

তার নাম ছিল টোকি। কিয়োটো সহরে সে থাকিত।

সবে মাত্র সন্ধ্যা নামিয়াছে—চোখে ভালো দেখা যায় না—তখনো বাতি কেউ জ্বালে নাই—আঁধারে সবই অস্পষ্ট—এমন সময় একদিন টোকি পথ চলিতেছিল।

সাম্‌নে একটা পুরানো জিনিসের দোকান। তার মধ্যে নানা রকমের ভাঙা ছেঁড়া জিনিস সাজানো রহিয়াছে। সে দোকানে একটা কাগজের পরদার উপর টোকির হঠাৎ নজর পড়িল। পরদার গায়ে একখানি ছবি আঁকা। ছবিটি তার বড় ভালো লাগিল। সেখানি সে কিনিয়া লইল।

আঁধারে সে ছবিখানি ভালো করিয়া দেখিতে পায় নাই, ঘরে আসিয়া বাতির আলোয় দেখিয়া মোহিত হইয়া গেল।

ছবিটি একটি মেয়ের—বয়স বছর পনেরো কি ষোলো। চমৎকার আঁকা! ছবি বলিয়া মনেই হয় না। যেন আসল মানুষটিকে পর্দার গায়ে কে আঁটিয়া দিয়াছে! চোখ দুটি যেন দুখানি পদ্মের পাতা। মুখখানি ঢলঢলে! টুকটুকে ঠোঁটের আগায় হাসিটি লাগিয়া আছে। মাথার কেশ যেন বাতাসে উড়িতেছে! চোখের পাতা যেন নড়ে! মুখের কথা যেন ফোটে-ফোটে!

টোকি তন্ময় হইয়া দেখিতে লাগিল। যতই দেখে, ছবি যেন ততই তাহাকে পাইয়া বসে—ছবি হইতে আঁখি সে ফিরাইতে পারেনা!

(২)

ঘরের বাতি পুড়িয়া নিবিয়া গেল। ভাবে এতই বিভোর যে সে তাহা লক্ষ্য করিল না। ঘরের মধ্যে স্তরে স্তরে অন্ধকার জমিতে লাগিল। সে অন্ধকার ভেদ করিয়া দেখে কাহার সাধ্য! ছবিটিকে পাশে রাখিয়া টৌকি জাগিয়া রহিল—তাহার চোখে ঘুম নাই। সে তখন আত্মহারা;—সব ভুলিয়া কি কথা যেন ভাবিতেছে!

এমনি করিয়া সময় কাটিতে লাগিল। টৌকি তাহা খেয়াল করিল না।

রাত্রি তখন খুব ঘনাইয়া আসিয়াছে। হঠাৎ টৌকি দেখিল পরদার গা হইতে মেয়েটি বাহির হইয়া আসিয়াছে;—পাশে বসিয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া আছে।

টৌকি চমকিয়া উঠিয়া তাহাকে ধরিতে

গেল। সে একটু সরিয়া বসিয়া বলিল —"ছুঁয়োনা, ছুঁয়োনা !"

মুখের কথা শুনিয়া টৌকির আনন্দ আর ধরে না ! সে এক নিশ্বাসে তাহাকে কত কথাই বলিয়া ফেলিল ;—প্রাণের মধ্যে কিছু গোপন রাখিল না !

তখন টৌকি শুনিল মেয়েটি যেন বলিতেছে—"টৌকি ! তুমি আমাকে এত ভালোবাসো ?"

টৌকি অনেক চেষ্টা করিয়াও সে কথার উত্তর করিতে পারিল না।

মেয়েটি আবার বলিল—"কিন্তু তোমার এ ভালোবাসা কি চিরদিন থাক্‌বে ?"

টৌকি ব্যগ্র হইয়া উত্তর করিল—"কেন ? কেন ? কিসের সন্দেহ ? আমার প্রাণ কি তুমি বোঝো না ?"

মেয়েটি একটু হাসিয়া বলিল—"বুঝি বই কি !"

টোকি সেই হাসির অর্থ বুঝিল, মেয়েটি তার কথা অবিশ্বাস করিতেছে। টোকি তখন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। ছুটিয়া তার পা ছুঁইয়া শপথ করিতে গেল। কিন্তু মেয়েটি পা দুখানি কোথায় লুকাইয়া ফেলিল, সে আর দেখিতে পাইল না। টোকির মনে বড় ব্যথা লাগিল, সে আর সামলাইতে পারিল না, —কাঁদিয়া ফেলিল!

তখন মেয়েটি টোকির খুব কাছ ঘেঁসিয়া বসিল। টোকির মনে হইল মেয়েটির গায়ের বসন যেন তার গায়ে আসিয়া ঠেকিতেছে, মাথার কেশ তার কপোল ছুঁইয়াছে, নিশ্বাসের বাতাস যেন বুকে লাগিতেছে, এক ফোঁটা তপ্ত চোখের জলও যেন হাতে আসিয়া পড়িল;—মেয়েটি তার বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়াছে!

* * * *

হঠাৎ টোকি চাহিয়া দেখে ভোরের

আলোয় ঘর ভরিয়া গিয়াছে। মেয়েটি কাছে নাই। পরদার গায়ে দাঁড়াইয়া হাসিতেছে!



মিলন

(১)

এক জমিদারের বাড়ি সে কাজ করিত। একদিন হঠাৎ সেই জমিদার সর্ব্বস্ব খোওয়াইয়া পথের কাঙাল হইয়া বসিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহারও দুরবস্থার শেষ রহিল না।

তার স্ত্রী ছিল রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী। নিজের হাতে সমস্ত দিন তাঁত বুনিয়া সেই দুর্দ্দিনে সে স্বামীর আহার জোগাইতে লাগিল।

স্বামী চাকরির সন্ধান করে, কিন্তু চাকরি কিছুতে মেলেনা। একদিন সে সন্ধান পাইল এক বড় ঘরের মেয়ে আছে তাহাকে বিবাহ করিলে একটা ভালো চাকরি হয়। সে আর বাচবিচার না করিয়া সেই মেয়েটিকেই বিবাহ করিয়া ফেলিল।

নূতন স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া সে বিদেশে চাকরি-স্থানে গেল। প্রথম স্ত্রী সেইখানে পড়িয়া রহিল। যাইবার সময় স্বামী তাহার দিকে একবার ফিরিয়াও তাকাইল না।

তাহার স্বভাব এতই কোমল ছিল যে মুখ ফুটিয়া স্বামীর উপর সে কোনো কথা কহিতে পারিল না। স্বামী চলিয়া গেলে ধূলায় লুটিয়া কাঁদিতে লাগিল!

(২)

নূতন বিবাহ করিয়া অবধি কিন্তু তাহার মনে শান্তি নাই। অর্থের কষ্ট রহিল না বটে কিন্তু মনের কষ্ট শতগুণ বাড়িয়া উঠিল। নূতন স্ত্রীর সহিত কিছুতেই তাহার মনের মিল হয় না। প্রতিদিন সহস্রবার প্রত্যেক খুটি-নাটি লইয়া সে স্বামীর মনে কেবলই আঘাত দেয়। তাহার মন কিছুতেই পাওয়া যায় না। সে আপনার খেয়ালে আপনিই থাকে;—স্বামীর

কোনো খপরই রাখে না! স্ত্রীর এই ব্যবহারে তার মনে বিন্দুমাত্র সুখ ছিল না।

তখন তাহার মনে সেই পুরানো দিনের কথা কেবলই জাগিত ;—প্রথম স্ত্রী যে সমস্ত দিন স্বামীর সেবা ভিন্ন আর কিছু জানিত না, '—আহা, সে কেমন ছিল! সে কি সুখেরই দিন! সবই হেলায় হারাইয়াছি!

যখনই এই সব কথা মনে পড়িত তখনই সে ভাবিত—"যাহাকে আমি পায়ে ঠেলিয়া চলিয়া আসিয়াছি সে যে শুধু আমার পায়ের সেবা করিতে পাইলেই সুখী ছিল। বিনা দোষে সেই সতীলক্ষ্মীকে ত্যাগ করিয়াছি। হায়, হায়! আমার মত নিষ্ঠুর কি আছে! সে শুধু আমার মুখের পানে চাহিয়া ছিল আমি তাহার মুখ চাহিয়াছি কই!"

এই অনুশোচনায় সে দগ্ধ হইতে লাগিল।

যাহাকে সে কোনো দিন আদর করে নাই —যাহার প্রতি কখনো সে কোনো মমতা

সেথায় নাই এখন তাহার মন তাহারই দিকে টানিতেছে। রত্ন ফেলিয়া সে কাচের লোভে ছুটিয়াছিল, এখন সে যে রত্ন চিনিয়াছে, আর কি স্থির থাকিতে পারে!

(৩)

তখন গভীর রাত্রি। গ্রাম নিস্তব্ধ। পথে লোক চলে না। আজ কত বছর পরে এই রাত্রের অন্ধকারে সে নিজের বাড়ির দরজায় আসিয়া ঘা দিল।

বাড়ির সে অবস্থা নাই। ফুলের বাগান জঙ্গলে ভরিয়া গিয়াছে—ঘরের চালে গাছ গজাইয়াছে! চারিদিক হাঁ হাঁ করিতেছে! জনমানবের চিহ্ন নাই!

দরজার গায়ে দুইবার ঘা পড়িতেই জীর্ণ দরজা আপনি খুলিয়া গেল। সে ভিতরে প্রবেশ করিল।

বাড়িতে আলো নাই;—ঘর সব শূন্য!

ভাঙা জানালার ভিতর দিয়া নিশার বাতাস কান্নার সুর ধরিয়া ঘরে ঢুকিতেছে! চামচিকাগুলো কালো কালো ডানা মেলিয়া ঘরের এধার ওধার করিতেছে!

বাড়ির অবস্থা দেখিয়া সেখানে যে কেহ বাস করে তাহা বোধ হইল না।

সে কি তবে নাই?—দেখা কি মিলিবে না? এই কথা মনে করিয়া সে ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল!

আজ সে হৃদয় ভরিয়া যে অর্ঘ্য সাজাইয়া আনিয়াছে তাহা কি বৃথা যাইবে!

বাড়ি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া সে কোথাও তাহাকে পাইল না। সে তখন মাথায় হাত দিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িল!

ঘরের মধ্যে বাতাস হা-হা করিয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছে! তাহার প্রাণের মধ্যেও হাহাকার উঠিয়াছে! তাহার প্রাণ কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছে—ওগো, এসো, এসো!

আমার প্রাণের প্রাণ এসো! না বুঝে না জেনে অপরাধ করেছি—একবার এসে শুধু ক্ষমা করে যাও!

*　　*　　*　　*

(৪)

বাড়ির এক কোণে একটি ছোট ঘরে মলিন বিছানার উপরে শুইয়া কে? ম্লান মুখে চাঁদের আলো পড়িয়াছে;—দেহখানি যেন মাটিতে মিশাইয়া আছে!

সে ছুটিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিল। তখনই তাহার স্ত্রী উঠিয়া বসিল। স্বামীকে দেখিয়াই তাহার ম্লান মুখ আনন্দে ভরিয়া গেল। সে আদর করিয়া হাত ধরিয়া স্বামীকে বসাইল;—মুখে অভিমানের চিহ্নমাত্র নাই!

স্বামী দেখিয়া অবাক হইয়া গেল।

সে কাতরকণ্ঠে কহিল—"সহস্র অপরাধ করেছি—ক্ষমা করো!"

স্ত্রী বলিল—"অপরাধ তুমি করেছ? —না, না!"

স্বামী কহিল—"সত্যই আমি অপরাধী! —তোমাকে আমি কষ্ট দিয়েছি—সেই জন্য আমার প্রাণ এখন কাঁদছে; —ক্ষমা করবে না?"

স্ত্রী কহিল—"ওকি কথা! তুমি কি আমার ক্ষমার পাত্র—তুমি যে আমার দেবতা! —আমায় কেন অপরাধী কর!"

স্বামী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে বলিল —হায়, হায় কি করেছি! কাকে অবহেলা করেছি!

তার পর দুইজনে মুখোমুখী হইয়া বসিল। আজ তাহাদের সত্যই মিলন—এমন পূর্ণ মিলন তাহাদের মধ্যে কখনো ঘটে নাই!

তাহারা দুজনে প্রাণ খুলিয়া কথা কহিতে লাগিল,—সে কত অতীতের কথা—কত ভবিষ্যতের কথা!

স্বামী মনের আবেগে যখনই নিজের

দোষের কথা—স্ত্রীর প্রতি তার অবহেলার কথা তোলে তখনই স্ত্রী তাহা চাপা দেয়। সে বলে—"আজকের এ আনন্দের দিনে মন-গড়া দুঃখের কথা কেন তোলো?—ও সব কিছু না!"

কথা কহিতে কহিতে কখন যে তাহারা ঘুমাইয়া পড়িল তাহা জানিতেও পারিল না।

*   *   *   *

যখন সে জাগিয়া উঠিল তখন জানালার ছিদ্র দিয়া ঘরে রৌদ্র প্রবেশ করিতেছে।

কিন্তু এ কি!—সে ধূলায় পড়িয়া কেন? স্ত্রী কোথায়?—পাশে তো নাই! সে ঘরে যে বহুদিন কেহ প্রবেশ করে নাই!

তবে কি কাল রাতের কথা শুধু স্বপ্ন!

য়োসকুরা

(১)

সেই য়োসকুরা গাছটির কাহিনী সবাই জানে।

এক গ্রামের কিনারায় সেই প্রকাণ্ড গাছটি ছিল। তাহাতে যখন ফুল ফুটিত তখন বাতাসে রাঙা রাঙা ফুলের পাতাগুলি উড়িয়া গ্রামটিকে ছাইয়া ফেলিত। পথ, ঘাট, মাঠ লালে লাল হইয়া যাইত।

তারই তলায় ছোট কুঁড়ে ঘরে একটি চায়ের দোকান ছিল। গ্রামের মুটেমজুর চাষারা যখন ভোরবেলা কাজে বাহির হইত তখন তাহারা সকলেই এই দোকান হইতে এক এক পেয়ালা চা পান করিয়া লইত।

দোকানী ভারি গরীব ছিল। চা বেচিয়াই তাহার সংসার চলিত। ক্রমে ক্রমে তাহার

পসার বাড়িতে লাগিল ;—দোকানে খরিদ্দার ধরে না! ভোর হইতে না হইতেই য়োসকুরার তলা লোকে ভরিয়া যায়। তাহার স্ত্রী ও ছোট মেয়েটি ছুটাছুটি করিয়া চা পরিবেষণ করে। দুজনে বিলি করিয়া পারিয়া উঠে না ;—দোকানী কেবল পয়সা কুড়ায়!

দেখিতে দেখিতে দোকানী বেশ দু পয়সা জমাইয়া ফেলিল। তখন সে কুঁড়ে ভাঙিয়া কোঠা তুলিল। লক্ষ্মী তাহার ঘরে বাঁধা পড়িলেন!

সকলে তখন বলিল ঐ য়োসকুরার দৌলতেই ওর ভাগ্য ফিরে গেল। সে নিজেও তাই বিশ্বাস করিত। যাহার কল্যাণে তার দুঃখের দিন শেষ হইয়াছে সেই গাছটিকে সে দেবতার মত ভক্তি করিত। দুঃখের সাথী ছিল বলিয়া তার প্রতি কেমন একটা মমতাও ছিল। সে অতি যত্নে

নিজের হাতে তার সেবা করিত। গাছের গায়ে কাহারো হাত দিবার হুকুম ছিল না।

তার এই সৌভাগ্যের কথা দেশে বিদেশে ছড়াইয়া পড়িল;—দেশবিদেশের লোক সেই গাছটিকে দেখিতে আসিত। সর্ব্বত্র রটিয়া গেল যে ঐ গাছের একটা ডাল যদি কাহারো ঘরে থাকে তো লক্ষ্মীও তাহার ঘরে বাঁধা!

(২)

একদিন দুপুর বেলা সে একলা বসিয়া আছে, এমন সময় একজন লোক আসিয়া হাজির;—পরণে তার সৈনিকের সাজ, কোমরে তরবার। লোকটার চেহারা দেখিয়া বোধ হয় না যে তাহার মধ্যে এতটুকু কোমলতা আছে—যেন গোঁয়ার গোবিন্দ! সে থামকা কহিল—"য়োসকুরাগাছ দেখতে এসেছি!"

তাকে চোখে দেখা মাত্রই দোকানীর

মনে কেমন ভালো বোধ হয় নাই; তাহার পর কথার স্বর শুনিয়া তাহার অঙ্গ জ্বলিয়া গেল, সে বলিল,—"দেখতে এসেছ, দেখনা বাপু! গাছ তো আমি সিন্দুকে পুরে রাখিনি!"

লোকটা বলিল—"গাছ শুধু দেখতে আসিনি—একটা ডাল চাই! আজ পর্য্যন্ত এত করেও তো এক কাণাকড়ি ঘরে আনতে পারলুম না। লোকে যে বলে ঐ মোসকুরার ডাল ঘরে থাকলে পয়সার ভাবনা থাকে না, তা একবার পরখ করতে হচ্ছে!"

দোকানী বলিল—"সে সব হবেনা বাপু! ও গাছ আমি কাউকে ছুঁতে দেবো না।"

লোকটা একটু হাসিয়া বলিল—"আমাকে তেমন লোক পাওনি যে এক কথাতেই ভেগে যাবো। আমি মনে যা করি কাজেও তাই!"

দোকানী বলিল—"হ'তে পারে, কিন্তু এখানে তা হচ্ছে না!"



এই কথা শুনিয়া, লোকটাকে দেখিয়া মনে হইল, সে রাগে থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। সে একটি কথা কহিল না। কোষ হইতে তরবার খুলিয়া ফেলিল—গাছের পানে ছুটিয়া গেল!

দোকানীও দৌড়িয়া গেল, চেঁচাইয়া বলিল—"খবরদার!"

সে কথা সে গ্রাহ্যই করিল না। তরবারি উঠিয়াছে—গাছের গায়ে পড়ে! দোকানী স্থির থাকিতে পারিল না, বিদ্যুতের বেগে ছুটিয়া গিয়া দু হাত দিয়া গাছটিকে আঁকড়াইয়া ধরিল। তরবারি আসিয়া তাহারই গায়ের উপরে পড়িল!

(৩)

দোকানী মারা যাইতেই চায়ের দোকান উঠিয়া গেল। তাহার স্ত্রীকন্যা মনের দুঃখে দেশত্যাগী হইল! বাড়িঘর ভাঙিয়া গেল। য়োসকুরার তলা শূন্য পড়িয়া রহিল!

সে যেন দিনে দিনে শুকাইতে লাগিল। তখন সে জায়গাটার অবস্থা দেখিয়া গ্রামের লোক সবাই চোখের জল ফেলিত। কি ছিল—কি হ'ল!

যে লোকটার জন্য এত কাণ্ড এই ঘটনার পর হইতে তাহার আর দুরবস্থার সীমা রহিল না। অর্থের অভাব আরো বাড়িয়া উঠিল—দুবেলা দুমুঠা আহার জোটে না। খুন করিয়াছে বলিয়া দেশের লোক তাহাকে দূর ছাই করে। তাহার জীবন ভার হইয়া উঠিল। লোকে বলিল—"য়োসকুরার গায়ে হাত তুলেছে ওর কি আর নিস্তার আছে!"

সে শুনিয়া রাগিয়া কহিল—"তবে য়োসকুরাকে আমি সমূলে নির্ম্মূল করব!"

তাহার বুড়ো বাপ ছিল সে বলিল—"না বাবা, অমন কাজ করিসনি—আরো কি হবে কে জানে!"

সে বাপের কথা শুনিল না।

সেই রাত্রেই সে সেই গাছতলায় গেল। সেখানে তখন জনমানব নাই। ঘোর অন্ধকার। চারিদিক খাঁ খাঁ করিতেছে। তাহার মনে হইল যেন নির্ম্মূল হইবার ভয়ে গাছটা থর থর করিয়া কাঁপিতেছে! তাহার ভারি আনন্দ হইল। সে খুব জোরে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। সেই বিকট হাসির শব্দ য়োসকুরাগাছের পাতায় পাতায় প্রতিধ্বনি তুলিতে লাগিল!

সে তখন শুনিল মানুষের গলায় গাছটা বলিতেছে—"মেরোনা, আমায় মেরোনা— তা হ'লে তোমার ভালো হবে না বলচি।"

গাছ মানুষের গলায় কথা কয় শুনিয়া সে চমকিয়া উঠিল। তাহার গাটা কেমন ছম্‌ছম্‌ করিতে লাগিল!

সে তাহা গ্রাহ্য না করিয়া কহিল—"ভালই হোক্, মন্দই হোক্—আজ আমার হাতে তোর নিস্তার নেই!"

গাছ আবার বলিল—"এখনও সময় আছে,

এখনও ফেরো। নইলে তোমার দুর্গতির অন্ত থাকবে না!"

এই কথা শুনিয়া সে আরো একবার হাসিল। সেই হাসিতে অত বড় য়োসকুরা গাছটা কাঁপিয়া উঠিল!

তারপর সে কোষ হইতে তরবারি খুলিয়া গাছের গায়ে আঘাত করিল। মানুষের গলায় গাছটা দারুণ আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। তখন তাহার কঠোর প্রাণটাও কি-জানি-কেন একটু কাঁপিয়া উঠিল।

য়োসকুরার মাথার উপরে তখন চাঁদ উঠিয়াছে। তারই আলোয় সে দেখিল তাহার তরবারি রক্তে ভরা! সে ভাবিল একি আশ্চর্য্য! এমন ত কখন দেখি নি! গাছের গায়ে মানুষের রক্ত! তার পর চাঁদের আলো যখন আরো উজ্জ্বল হইয়া উঠিল তখন দেখে রক্তে মাখা একটা ছিন্ন মানুষের দেহ পড়িয়া আছে! সে কে? সে তার বুড়ো বাপ!